

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুম্মাআ

আল্লাহর ওপর পরম নির্ভরতার প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের এক ঈমানদীপ্ত আলোচনা।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস
আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আযিয কর্তৃক ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের
(টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মবারকে প্রদত্ত খুতবা জুম্মাআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্বাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্বাদু আনু মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু।
আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি
রব্বিল ‘আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাই’ন।
ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লায়ীনা আনআ’মতা আ’লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি ‘আলায়হিম।
ওয়ালাদদল্লীন।

তাশাহুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়দনা হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহর ওপর
মহানবী (সা.)-এর নির্ভরতা প্রসঙ্গে বিগত জুম্মাআয় আমি তাঁর মক্কা হতে হিজরতের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিলাম।
এই সফরের আরও কিছু বিবরণ ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান এবং এতে তাঁর আল্লাহর ওপর পরম নির্ভরতার মহান
মর্যাদা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়।

হিজরতের সময় কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে সুরাকা ইবনে মালিক মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু
বকর (রা.)-এর পিছু ধাওয়া করেছিল। সুরাকা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং এই ঘটনা
বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, কুরাইশরা মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-কে জীবিত বা মৃত
বন্দী করে আনতে পারলে একশত উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। সুরাকা যখন জানতে পারল যে সমুদ্র
উপকূলের দিকে তিনজনের একটি কাফেলা যাত্রা করছে এবং তীব্র সন্ধান রয়েছে যে, তারা স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) ও
তাঁর সঙ্গী-তখন সে এই সংবাদটি গোপন রাখল যেন অন্য কেউ এই পুরস্কারের অংশীদার হতে না পারে। সুরাকা
তার দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে কাফেলার পিছু ধাওয়া করা শুরু করল। সে দ্রুতই কাফেলার সন্নিহনে পৌঁছে গেল,
এমনকি মহানবী (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর কণ্ঠস্বরও তার কানে আসতে লাগল। হযরত আবু বকর
(রা.) বারবার পেছনে ফিরে দেখছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) এদিক-ওদিক একেবারেই তাকাচ্ছিলেন না। অকস্মাৎ
সুরাকার ঘোড়াটি অস্বাভাবিকভাবে হেঁচট খেল এবং তার পা বালির ভেতরে পুঁতে গেল। সে ভাগ্য গণনার তীর
বের করল, যা তার ইচ্ছার প্রতিকূলে এলো; তথাপি পুরস্কারের লোভে সে সন্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকল।
অবশেষে ঘোড়ার পা পুনরায় বালিতে গভীরভাবে পুঁতে গেল এবং সুরাকা উপলব্ধি করল যে, এই অনুসরণের মাঝে
কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। তখন সুরাকা নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে উচ্চস্বরে ডাক দিল এবং বলল, তার পক্ষ
থেকে কোনো অনিষ্ট পৌঁছাবে না। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কী
চায়। সুরাকা তার পিছু ধাওয়া করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলল, মক্কাবাসীরা আপনাদের উভয়ের জন্য পুরস্কার
নির্ধারণ করেছে এবং সে সেই লোভেই এসেছিল; কিন্তু তার সাথে যা ঘটেছে তা থেকে সে বুঝে গেছে যে এই
অনুসরণ মোটেও সঠিক নয়। সে পথের পাথেয় ও সফরের সরঞ্জামের প্রস্তাবও পেশ করল, কিন্তু মহানবী (সা.) তা
গ্রহণ করলেন না; বরং কেবল এতটুকু বললেন, “আমাদের খবর কারো কাছে প্রকাশ করো না।” সুরাকা সে বিষয়ে
অঙ্গীকারবদ্ধ হলো এবং একটি অভয়পত্র প্রার্থনা করল। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তাকে লিখিত অভয়পত্র

প্রদান করা হলো। এক বর্ণনামতে, বিদায়লগ্নে মহানবী (সা.) সুরাকাকে সম্বোধন করে বললেন: “হে সুরাকা! তোমার কেমন অনুভূতি হবে যখন পারস্য সম্রাট কিসরার রাজকীয় কঙ্কন তোমার হাতে পরিয়ে দেওয়া হবে?” সুরাকা বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করল: “কিসরা ইবনে হরমুজ?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, সেই কিসরা ইবনে হরমুজই।” পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন কিসরার স্বর্ণকঙ্কন, মুকুট ও কোমরবন্ধ বিজয়ের গনিমত হিসেবে দরবারে নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি (রা.) সুরাকাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সেই রাজকীয় কঙ্কন সুরাকার দুই হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন: “বলো-সমস্ত প্রশংসা কেবল সেই পরম আল্লাহর, যিনি কিসরা ইবনে হরমুজের কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এক সাধারণ আরবীকে পরিধান করিয়েছেন।”

হযর আনোয়ার (আই.) বলেন, উপায়-উপকরণের আয়োজন ও ব্যবহার এবং অতঃপর আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা-এটি অত্যন্ত অপরিহার্য বিষয়। মহানবী (সা.)-এর সুদৃঢ় তাওয়াক্কুলের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এই সূক্ষ্ম মূলনীতিটি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, যে ব্যক্তির আল্লাহর সন্তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং সেই সাথে এই দৃঢ় বিশ্বাসও রয়েছে যে আল্লাহ তাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তবে সে কীভাবে কর্মবিমুখ হতে পারে? সে তো জগতের সবচেয়ে বেশি কর্মঠ ও কর্মতৎপর মানুষে পরিণত হয়! রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমস্ত কর্ম তাঁর দৃঢ় ঈমানের ফসল ছিল; কেননা যে ব্যক্তি অনুধাবন করে যে আল্লাহ এক এবং তিনি আমাকে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সেই লক্ষ্য অর্জনে আত্মা চেষ্টা করবে। অতএব দেখুন, মহানবী (সা.) একদিকে যেমন স্বীয় ঈমানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন-যেখানে সাওর গুহায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আশ্বস্ত করে বলেন, “হে আবু বকর! ব্যাকুল হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এবং তিনিই আমাদের পরম রক্ষক”-ঠিক তেমনি অন্যদিকে দ্বীনের অন্যান্য কর্মে দিবারাত্রি এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে মনে হয় যেন সমগ্র বিশ্বজগতের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছে।

অতএব, মানবীয়ভাবে যতটুকু কৌশল ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, তিনি তার সমুদয় অবলম্বন করতেন এবং অতঃপর আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন। ফলে তাঁর এই বিশ্বাসের রূপটি কোনো অজ্ঞতা কিংবা অলসতাপ্রসূত ছিল না; বরং তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় উজ্জ্বলিত। আর এই জাতীয় সুগভীর বিশ্বাস কেবল সেই ব্যক্তির মাঝেই মূর্ত হয়ে ওঠে, যিনি একই সাথে খোদার ওপর ভরসা করেন এবং নিষ্ঠার সাথে কাজও করে যান-অর্থাৎ কর্ম ও পরম ভরসা উভয়কে একসাথে ধারণ করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, মক্কা মুয়াজ্জমায় দীর্ঘ তেরো বছর যাবত চরম বিপদের দিনগুলোতে মহানবী (সা.) এক সত্যনিষ্ঠ পুরুষের পূর্ণ নৈতিক চরিত্রের মহান আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সর্বদা পরমেশ্বরের ওপর ভরসা ছিল, অস্থিরতা ও ছটফটানি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন, স্বীয় দায়িত্ব পালনে কোনো অলসতা প্রদর্শন করেননি এবং কোনো শক্তির ভয়ে ভীত হননি। কাফেররাও তাঁর এই অটল স্থৈর্য ও দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করে এই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছিল যে, এমন অভূতপূর্ব সহনশীলতা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ব্যতীত কখনোও সম্ভব নয়। মদীনায় আগমনের পরও মহানবী (সা.) খোদার ওপর পূর্ণ ভরসা অক্ষুণ্ন রেখে বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ মদীনায় আগমন করলেন এবং আনসারগণ তাঁদের আশ্রয় দান করলেন, তখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাঁদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেল। মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা এমন সংকটময় ছিল যে, অস্ত্র পরিধান না করে তাঁদের কোনো রাত পার হতো না এবং কোনো প্রভাতও আসত না। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখার পাশাপাশি তাঁরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের আত্মরক্ষার সুব্যবস্থাও অক্ষুণ্ন রাখতেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একদা মহানবী (সা.) জেগে রাত কাটাচ্ছিলেন এবং বললেন, “আহা! যদি আজ রাতে আমার অনুসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে কোনো সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি এসে আমাকে পাহারা দিত!” এমন অবস্থায় হঠাৎ অস্ত্রের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলে হযরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিবেদন করলেন যে, তিনি তাঁর সুরক্ষার নিমিত্ত প্রহরা দিতে এসেছেন। অপর এক বর্ণনায় হযরত সা’দ এবং হযরত হুজায়ফা (রা.)-উভয়েরই আগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁদের জন্য দোয়া করেন এবং শান্তিতে নিদ্রামগ্ন হলেন।

ঠিক এই সময়েই আয়াত অবতীর্ণ হলো, **وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ**, আল্লাহ্ স্বয়ং মানবজাতির অনিষ্ট হতে আপনাকে সুরক্ষিত রাখবেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয় নবী (সা.) বললেন, এখন প্রহাররত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ আবাসে ফিরে যেতে পারেন, কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সুরক্ষার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, যতক্ষণ না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.) বাহ্যিক আত্মরক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন; আর যখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুরক্ষার অকাট্য নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হলো, অমনি তিনি সেই প্রহারর ব্যবস্থা তুলে নিলেন।

হযর আনোয়ার (আই.) বলেন, যখন রসূল করিম (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্রসমূহ প্রেরণ করলেন, তখন পারস্যপতি কিসরা তাঁর সেই পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। মহানবী (সা.) যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ ভরসার আশ্রয় উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, “আল্লাহ স্বয়ং এদের সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবেন।” কিসরা ইয়েমেনের শাসনকর্তার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে বন্দী করার উদ্দেশ্যে দুজন প্রহরী প্রেরণ করল। তারা এসে যখন তাদের অধিপতির নির্দেশ মহানবী (সা.)-কে অবগত করল, তখন তিনি বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন না; বরং পরম প্রশান্তিতে বললেন, “আজকের রাতটি এখানে অতিবাহিত করো, আগামীকাল আমি তোমাদের উত্তর দেব।” পরদিন প্রভাতে তিনি তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, “আমার প্রতিপালক আজ রাতে তোমাদের প্রভু অর্থাৎ কিসরাকে বিনাশ করেছেন।” পরবর্তীতে জানা যায় যে, ঠিক সেই রাতেই পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ তার স্বীয় পুত্র শেরাওয়াই সাইরাস কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

মহানবী (সা.) দ্বীনের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধাভিযানগুলোতেও আল্লাহ্র নির্দেশে ও তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখেই যাত্রা করতেন এবং যাত্রাকালে এই আকুল বিনতি পেশ করতেন, **اللَّهُمَّ أَنْتَ عِزِّي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ** অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুশক্তি, তুমিই আমার পরম সাহায্যকারী এবং তোমারই আশ্রয়ে ও শক্তিতে আমি সমরে অবতীর্ণ হই।”

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, সংকটের মুহূর্তে মানুষের অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক হলেও কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্র ওপর থেকে ভরসা হারানো উচিত নয়। মহানবী (সা.)-এরও বদরের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে চরম ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল, যারপরনায় তিনি নিবেদন করেছিলেন: “হে আমার প্রভু! তুমি যদি আজ এই ছোট্ট জামা'তটিকে বিনাশ হতে দাও, তবে এই ধরাধামে তোমার ইবাদত করার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।” কিন্তু মহানবী (সা.)-এর এই ব্যাকুলতা কেবলই মানবীয় অনুভূতিপ্রসূত ছিল; কেননা অপরপ্রান্তে খোদার ওপর পরম আস্থা তৈরি করেছিল বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হতে দেননি। তাঁর প্রলুব্ধ দৃষ্টি ছিল উপরোক্তাশের পানে এবং অন্তরে ছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লাহ্ তাঁকে কখনোও বিনাশ হতে দেবেন না। তিনি নিরাশা কিংবা হতাশাকে সামান্যতমও কাছে ঘেঁষতে দেননি। এই জাতীয় অস্থিরতার আগমন মানুষের নৈতিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার পূর্ণতার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য; তবে মানুষের উচিত নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া, কেননা নিরাশা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বৈশিষ্ট্য। মানবীয় দুর্বলতাবশত নানা রূপ ভাবনা অন্তরে অস্থিরতার সংশয় তৈরি করে, কিন্তু সুদৃঢ় ঈমান সেই সমুদয় সংশয় অপসারিত করে দেয়। মানবীয় প্রকৃতি অস্থিরতা ডেকে আনে, আর ঈমান তা দূর করে দেয়।

আহযাব যুদ্ধে মুসলমানগণ মদীনাতে অবস্থান করেই শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এটি খোদার ওপর বিশ্বাসের কোনো অভাবের কারণে ছিল না; বরং তা ছিল সুনির্দিষ্ট এক যুদ্ধকৌশল মাত্র। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হতে সুরক্ষার নিমিত্তে মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করা হলো। তীব্র দারিদ্র্য ও চরম অভাব-অনটনের মাঝেও মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই পরিখা খননের কাজে শরিক হলেন। এই আহযাব যুদ্ধের সময়কালেই হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, পরিখা খননের সময় পথিমধ্যে একখানা সুকঠিন ও অখণ্ড পাথর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। স্বয়ং মহানবী (সা.) সেই পাথরখানা খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য নিজ হস্তে কোদাল তুলে নিলেন-যদিও তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর পবিত্র উদরে পাথর বাঁধা ছিল এবং বিগত তিন দিন যাবত তিনি কিছুই আহার করেননি। হযরত জাবের (রা.) বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছু যব এবং একটি ছাগলছানার সুব্যবস্থা করলেন। খাদ্য প্রস্তুত করে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন; কিন্তু মহানবী (সা.)

সমস্ত মুহাজির ও আনসার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে সেখানে গমন করলেন। সামান্য সেই খাদ্যে আল্লাহ্‌তা'লা এমন বরকত দান করলেন যে, সকল সাহাবী পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন; এমনকি খাদ্য উদ্ধৃত্তও রয়ে গেল। মহানবী (সা.) হযরত জাবেরের স্ত্রীকে বললেন, “এখন তোমরাও এটি আহার করো এবং অন্যদের কাছে উপটোকন হিসেবে পাঠাও, কেননা মানুষ চরম বুভুক্ষু অবস্থায় রয়েছে।” হুনায়েনের যুদ্ধে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের এক সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানগণ কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সমরপ্রাঙ্গণ হতে পিছুপা হননি। তিনি স্বীয় শ্বেতশুভ্র খচ্চরের ওপর আরোহী ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তখন মহানবী (সা.) পরম বীরত্বে এই কাব্যপঙ্ক্তি আবৃত্তি করছিলেন: **أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ** অর্থাৎ “আমিই আল্লাহ্ প্রেরিত সত্য নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।”

বদরের যুদ্ধে হাবীব ইবনে ইয়াসাফ নামক এক সাহসী ও পরাক্রান্ত যোদ্ধা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তখনও সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। মহানবী (সা.) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, “আমাদের সাথে কেবল তিনিই সমরে গমন করবেন, যিনি আমাদের ধর্মের ওপর বিশ্বাস রাখেন।” হাবীব ইবনে ইয়াসাফ পুনরায় এবং অতঃপর তৃতীয়বারও নিবেদন নিয়ে এলো। অবশেষে যখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনয়ন করো?” সে ইতিবাচক উত্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। এই ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চরম সংকট ও জরুরি প্রয়োজন সত্ত্বেও রসূল করিম (সা.) আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেননি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, বর্তমানের তথাকথিত বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে কাউকে স্বীয় শত্রুতে পরিণত করা এক মারাত্মক ভুল; কিন্তু সত্য বলতে এটিও সত্যতার এক অকাট্য প্রমাণ। মহানবী (সা.) অসত্যের সাথে সামান্যতম আপোষ করেননি; বরং সকলের সাথেই সম্পর্ক ছেদ করে সত্যে অটল থেকেছেন। তাদের দৃষ্টিতে-নাউযবিল্লাহ-তিনি ভুল করেছিলেন! অথচ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে সকলের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা তাঁর সত্যতা ও সত্যতার এক উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা থেকে তাঁর অন্তরের ঈমানী শক্তির সুউচ্চ পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ্ সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়া'আতি আ'মালিনা-মাইয়্যা'হ্‌দিহিল্লাহ্ ফালা মুযিল্লালাহ্ ওয়া মাই ইউযলিলহ্ ফালা হাদিয়াল্লাহ্-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকালাহ্ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ্-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুম ওয়াদ'উহ্ ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকুরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar ^(at) 18th September 2026	To,
Distributed by	
Ahmadiyya Muslim MissionP.O..... Distt.....Pin.....W.B	
বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org www.mta.tv www.ahmadiyyamuslimjamaat.in	